দিশাহারা, বেঁচে মরা

মধুসূদন দত্ত

এক পরিবারের গল্প মনে পড়ে । ভদ্রলোক ছিলেন সামাজিক কাজকর্মে উৎসাহী । ষাটের দশকের মাঝামাঝি একটা কথা অনেকের মত তিনিও বলতেন - মার্কসের জন্মের একশো বছরের মাথায় প্রথম একটি দেশে সমাজতন্ত্র এসেছে, মার্কসের মৃত্যুর একশো বছরের মাথায় নিশ্চয় পৃথিবীর বহু দেশই সমাজতান্ত্রিক হয়ে যাবে । অনেকের মত তাঁরও স্বপ্ন ছিল ভারতবর্ষও সেই দলে থাকবে । এত আশা নিয়ে অল্প বয়সে ভদ্রলোক হঠাৎ অল্প কদিনের অসুখে মারা গেলেন তাঁর তরুণী স্ত্রী এবং স্কুলে পড়া ছেলেকে রেখে । মহিলা তরুণী হলেও ছিলেন সংকল্পে স্থির । তিনি জানতেন স্বামীর ভিটে তাকে রক্ষা করতে হবে এবং ছেলেকে মানুষ করতে হবে - কি করে মানুষ করবেন সে সম্বন্ধে অবশ্য বিশেষ কোন ধারণা তার ছিল না । মেধাবী ছেলে দেখতে দেখতে লেখাপড়া শিখে কলকাতায় ভাল চাকরি পেল। ছেলের শহরে আকর্ষণ ; সে শহরে ঘর নিল, মাকে ডাকল । মহিলা শুধু জানেন স্বামীর ভিটে - আর কিছু তার জানা নেই, তাই তিনি ভিটে আঁকড়ে রইলেন । ক্রমশঃ ছেলে দূরে সরে গেল । মহিলা বৃদ্ধা হলেন । একদিন তিনি মরে বাঁচলেন - নিঃসঙ্গ, স্বামীর ভিটেয় ।

বামফ্রন্টের আদিপর্ব :

এদেশে কি করে সমাজতন্ত্র আসবে ? পশ্চিমবাংলার বাইরে আর একটা কি দেড়টা রাজ্য ছাড়া যে কমিউনিষ্টদের বিশেষ কোন প্রভাব নেই । অনেক বিতর্ক এবং দ্বন্দ্বের মধ্যে ১৯৭৭-এ বামফ্রন্ট পশ্চিমবাংলায় ক্ষমতায় এলো । অনেকেই উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন । এবার অন্য রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবাংলার একটা তফাৎ ঘটবে । হলও তাই । বহুদিনের প্রতীক্ষিত এবং ফেলে রাখা একটা কর্তব্য সম্পাদন হল । ভূমিসংস্কার হল । সারা ভারত তাকিয়ে দেখল । বামফ্রন্ট আবার ক্ষমতায় এলো - পঞ্চায়েতীরাজ কায়েম করার দিকে পশ্চিমবঙ্গ এগিয়ে চলল । বামফ্রন্ট তার ভিটে আঁকড়ে রইল । তাবড় তাবড় মন্ত্রীরা বিবৃতি দিলেন গ্রামেই তাদের নজর - শহরে নয় ।

এদিকে একের পর এক রাস্তাঘাট ভাঙ্গল, শহরের ক্রমাবনতি হল । একের পর এক শিল্প বন্ধ হবার প্রক্রিয়া বজায় রইল । শুধু বহুপূর্বে কাজ শুরু হওয়া মেট্রো রেল শহরে নতুন প্রাণের সঞ্চার করল । গল্পের মহিলার মত বামফ্রন্ট নতুন হাওয়া চায় না । তারা কম্পিউটার বিরোধী, বিশ্বায়ন বিরোধী । শিক্ষায় পশ্চিমবঙ্গ বহু রাজ্যের তুলনায় এগিয়ে ছিল । কোন দরিদ্র পরিবার দারিদ্র্য থেকে স্থায়ী মুক্তির জন্য সন্তানের শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেয় । পশ্চাতপদ রাজ্য বা রাষ্ট্রও স্বাভাবিক বুদ্বিতে একই কাজ করে । সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চিন তা করে দেখিয়েছে । কিন্তু পশ্চিবঙ্গে বামফ্রন্ট তা করল না । গল্পের মহিলা যা স্বাভাবিক বুদ্ধিতে বুঝেছিলেন বামফ্রন্ট তা বুঝল না।

কৃষিতে পশ্চিমবঙ্গ এগিয়ে গেল তবুও শিক্ষায় ক্রমশঃ পিছিয়ে পড়তে লাগল । কৃষিকেই বামফ্রন্ট নিজের ভিটে করেছিল । ভূমিসংস্কার এবং পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় পার্টির ভিত শক্ত হল কিন্তু সামগ্রিকভাবে রাজ্যের অর্থনীতির ভিত শক্ত হতে পারল না । এদিকে বামফ্রন্ট ক্ষমতা ভোগ করে স্ফীত হল এবং ক্রমশঃ অন্তঃসারশূণ্য হল । তাই প্রচারের বাদ্য চড়া হল । মার্কসের মৃত্যুর একশো বছরে কিছু পরে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন বিদায় নিল । বামফ্রন্ট রইল তার ভিটে আঁকড়ে । গল্পের মহিলা মরে বেঁচেছিলেন, বামফ্রন্ট বেঁচে মরল । আদর্শগত দৈন্য ঢাকতে অবলম্বন একমাত্র মার্কিণ বিরোধিতা । শিক্ষায় তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়াও বুঝি মার্কিন বিরোধিতারই এক প্রকাশ ।

এখন থেকে দুশো বছর আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট থোমাস জেফারসন ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে তাঁর কবরের পাথরের যেন উল্লেখ না থাকে তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ছিলেন - শুধু যেন উল্লেখ থাকে তিনি ছিলেন ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা । প্রেসিডেন্টের পদের থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতার সম্মান তাঁর কাছে এত বড় ছিল । শিক্ষার প্রতি এই প্রগাঢ় শ্রদ্ধা একটা জাতির ভিত তৈরি করেছিল । মুক্ত চিন্তা ও গবেষণা জাতির জীবনে স্পন্দন আনে । বামফ্রন্টের আছে বিকল্প পন্থা । প্রাথমিক স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত তারা নিয়োগ করে চলল অনুগতজনদের । আনুগত্য হয়ে উঠল ব্যক্তিগত উন্নতির এবং বাঙালীর

সর্বনাশের সোপান । মুক্ত চিন্তার থেকে বড় পার্টি লাইন । পার্টি লাইন ধরে বামফ্রন্টের ভিত হল সুরক্ষিত ।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিল্পের জীর্ণদশা আর ভূমিসংস্কার দিয়ে ঢাকা যায় না । শিল্পপতিদের সীমাহীন লালসা ও দানবিক উদ্যোগ সম্বন্ধে বললেও কি করে তাদের বাদ দিয়ে শিল্পায়ন হবে এ সম্বন্ধে মার্কস বিস্তারিত ভাবে বলে যান নি । সমাজতান্ত্রিক শিল্পগঠন নিয়েও উৎসাহ ইতিমধ্যে স্তিমিত । সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের আগেই চিন সে পথ ত্যাগ করেছে । অথচ রাজ্যে ক্ষমতায় থাকতে গেলে শুধু কৃষি নিয়ে চলে না । নব্বইয়ের দশকের গোড়ায় কেন্দ্রীয় সরকার উদারনীতি ঘোষণা করলে বিভ্রান্ত বামফ্রন্ট তার বিরোধিতা করল । ভেতরে ভেতরে তারা টের পেতে শুরু করেছিল শুধু ভূমি সংস্কারকে পুঁজি করে আর চলবে না । তাই কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিকে মুখে সমালোচনা করলেও ক্রমশঃ তাকেই আঁকড়ে ধরল । সান্ত্বনা পেল চিনের উদাহরণ থেকে। এ কি মজা ! শিল্পায়নের সাথে যুক্ত আছে বহু টাকা যার একটা ভগ্নাংশও করায়ত্ত করতে পারলে কাজ হয় । চিন তো দেখাচ্ছে শিল্পায়নের সাথে পার্টির একনায়কত্বের বিরোধ নেই । পুঁজিবাদিরা জাত বিচার করে না । পুঁজির বিকাশই তাদের একমাত্র বিবেচ্য । তাই পার্টির সাথে পুঁজির পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট । নতুন স্লোগান হল কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ আর পুঁজির বিকাশই সমাজতন্ত্রের প্রাথমিক শর্ত । এবার বামফ্রন্টের ভিত নড়ল ।

কথায় বলে হিঁন্দু যখন গরু খায় মুসলমানকে ছাড়িয়ে যায় । সি. পি. এম যখন শিল্প চায় তখন ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিষ্ট মারণ যজ্ঞের সহকারী পুরোহিত সালেমও স্বাগত এবং তার জন্য হাভাতে চাষিগুলোকে পিটিয়ে জমি থেকে উৎখাতও করতেও পার্টি দ্বিধাগ্রস্ত নয় । শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিয়ে উন্নত মানব সম্পদ হিসাবে রাজ্য এদের গড়ে তোলেনি । তাই উন্নয়নে এদের স্থান কোথায় ? উন্নয়ন চায় 'উন্নততর' বামফ্রন্ট । এক অদ্ভুত দানব ! এর মাথা যদি বলে ধণতন্ত্র তো লেজ বলে সমাজতন্ত্র আর পেট বলে ক্ষমতা ।

গণতান্ত্রিক ভারতে ''সংস্কৃতির পীঠস্থান'' পশ্চিমবাংলায় অধিষ্ঠিত বামফ্রন্ট সরকার। দেরীতে হলেও সে বুঝেছে শিল্পায়ন ছাড়া বেকারি দূর হবে না । তাই শিল্পের জন্য জমি চাই। জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পের টাকা ফেরৎ যাক । চাষাভুষোগুলো চাইলেই যদি কাজ পায়

তবে পার্টিকে রেয়াত করবে কেন ? এখন লক্ষ্য জমি অধিগ্রহণ । মালিককে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে কেড়ে নাও জমি । চুলোয় যাক ভূমিহীন চাষি, বর্গাদার, আর সব । অপারেশন বর্গাতো এই বামফ্রন্টই করেছে । শুধু বর্গাদার নিয়ে থাকলে চলবে ? এখন অপারেশন জমি অধিগ্রহণ । সোজা কথায় কাজ হলে ভাল, নয়ত অন্য দাওয়াই ।

জমি অধিগ্রহণ কান্ড :

এই কান্ডটা অতি সাম্প্রতিক এবং পশ্চিমবাংলার ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। প্রতিটি চিন্তাশীল নাগরিকের প্রতিবাদ করার দায়িত্ব (যা আইনত unenforceable) আজ ভাষা চায় । তাই বিভ্রান্তি কাটিয়ে ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ অত্যন্ত জরুরী । বর্তমান প্রতিবেদনে এখন এই কাজটাই একটু বিস্তারিত ভাবে করার চেষ্টা করব । সম্প্রতি যে বিভীষিকা রাজ্যকে গ্রাস করেছে তা হ'ল সন্ত্রাস । বিবেকবান বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের মত করে এর প্রতিবাদ করছেন । অনেকেই নীরব রয়েছেন । সংবাদপত্র এবং টি ভি তে সন্ত্রাসের বিভিন্ন ঘটনার বিবরণের মধ্যে অস্বচ্ছতা থেকে যায় বহু ক্ষেত্রেই । এর সঙ্গে আছে বিভ্রান্তিকর প্রচার । তারপর আছে শান্ত পরিকল্পিত মিথ্যার জাল, এর সঙ্গে মিশেছে মানুষের স্বাভাবিক অক্ষমতা । দম্ভ ও কপটতা সিংহাসনের আলোকচ্ছটার মায়াজালে মিশে যায় নিজেকে ধরা না দিয়ে । পক্ষান্তরে অত্যাচারিতের হাহাকার ও পরাজয়ের গ্লানি চরম সত্যকেও আবিল করে দেয় । অত্যাচারের যখন কিনারা হয় না তখন অত্যাচারিতের পাশে বেশী দিন থাকলে আসে মানসিক অবসাদ । তাই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হতভাগ্যকে ত্যাগ করা । কোন পক্ষ না নেবার নাম নিরপেক্ষতা । তাই চিন্তাশিল লেখকও অনেক সময় উভয় পক্ষের দোষের উল্লেখ করে নিজের নিরপেক্ষতার প্রমাণ দেন । যে নিরপেক্ষতা আত্মরক্ষার বর্ম, ন্যায়ের প্রতি নিষ্ঠার প্রকাশ নয় । একজন স্বনামধন্য চলচ্চিত্র পরিচালক প্রতিবাদী বুদ্ধিজীবিদের মিছিলে হাঁটলেন তার পর আবার সরকার-সমর্থক বুদ্ধিজীবীদের মিছিলে হাঁটলেন । এত নিরপেক্ষ । পুরষ্কারও নিলেন অচিরেই ।

বস্তুত কোন সামাজিক দ্বন্দের ঘটনাই একদিন হঠাৎ করে ঘটে না । সংঘর্ষের বীজ ক্রমশ অঙ্কুরিত হয়ে বৃহৎ আকার নেয় অবাধে বাড়ার সুযোগ পেলে । তাই শুধু সংঘর্ষের দিকে

তাকালেই ঘটনার বিচার হয় না - বহুদিন ধরে বেড়ে ওঠা পরিপ্রেক্ষিত বিচার না করলে অনেক ক্ষেত্রেই বিচার সঠিক হয় না । একথা বিশেষ করে সত্যি যখন দ্বন্দটা দাম্ভিক রাজশক্তির বিরুদ্ধে হতভাগ্য দরিদ্র মানুষের ।

ধরা যাক আমার জমি সরকার অধিগ্রহণ করতে চায় । সরকার আমার ধরা ছোঁয়ার বাইরে । আমি আবেদন করতে পারি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের কাছে, তাতে কাজ না হলে আদালতে যেতে পারি । এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত হানাহানির কোন সুযোগ নেই । আমি যদি নিরাশাবাদী, উদ্যোগহীন মানুষ হই তবে ভবিতব্য মনে করে সরকারের দেওয়া ক্ষতিপূরণ মেনে নিয়ে চলে যাব । কাজেই আবেদন নিবেদন কতদূর এগোবে তা নির্ভর করবে আমার ব্যক্তিত্বের উপর। আমি নৈতিকতায় আবদ্ধ থেকে এবং আইনের অনুশাসন মেনেও নানা ভাবে অধিগ্রহনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারি । সভ্য সমাজে এই প্রতিক্রিয়া গুরুত্ব পায় ।

বহু সংখ্যক মানুষের জমি একসঙ্গে অধিগ্রহণ হলে যদিও প্রত্যক ব্যক্তির ক্ষেত্রেই উপরের কথা প্রযোজ্য তবুও বিরোধহীন ভাবে ক্ষতিপূরণ মেনে নেবার সম্ভাবনা প্রায় থাকে না যদি না প্রতিবাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের ভয় প্রবল হয় । বহুসংখ্যক মানুষের মধ্যে কিছু মানুষ থাকেই যারা আশাবাদী এবং উদ্যোগী, তারাই এ ক্ষেত্রে আবেদন-নিবেদন বা আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে । এটাই স্বাভাবিক, আইনানুগ এবং নৈতিকতা গ্রাহ্য । তাই সভ্য গণতান্ত্রিক দেশে জমি অধিগ্রহণ একটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার ।

জমি অধিগ্রহণ যদি কোন বেসরকারী সংস্থার দ্বারা হয় তবে একটা ভয়ের দিক থাকতে পারে । বেসরকারী সংস্থা গুন্ডা দিয়ে যদি নেতৃত্বকে দমিয়ে রাখতে পারে তা হলে হয়ত কম খরচে জমি অধিগ্রহণ সম্ভব । আন্দোলন যদি যথেষ্ট শক্তিশালী হয় এবং প্রশাসন সজাগ হয় তাহলে বেসরকারী সংস্থা সাধারণতঃ সন্ত্রাসের পথে যাবার কথা ভাববে না । আবার সন্ত্রাস অন্যদিক থেকেও আসতে পারে । আন্দোলকারীদের একটা অংশ বেসরকারী সংস্থার উপর জুলুম করতে পারে এই ভয়ে যে ক্ষতিপূরণ কেউ কেউ মেনে নিলে আন্দোলন দুর্বল হয়ে যেতে পারে। সম্ভাবনার আরও নানা দিক আছে । সব দিক ভেবে দেখলে সহজেই বোঝা যায় যে কোন কোন ক্ষেত্রে শুধু গুজব বা আশঙ্কার কারণেও সংঘর্ষ বেধে যেতে পারে । কারণ জমির সঙ্গে মানুষের

আবেগ ও জীবন-মরণের প্রশ্ন জড়িত । শুধু জমির মালিকই নয় - জমিতে খেটে খাওয়া আরও বহু মানুষের স্বার্থ জড়িত ।

স্পষ্টতই সুষ্ঠু অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত হল গণতন্ত্রের স্তম্ভগুলোর সক্রিয়তা - নিরপেক্ষ ও সজাগ প্রশাসন এবং বিচার ব্যবস্থার প্রতি সম্মান ও আস্থা । মানুষের আন্দোলনের অধিকার গণতন্ত্রে স্বীকৃত । যারা এক সময় জঙ্গী আন্দোলন করে মানুষের সমর্থন পেয়েছে ক্ষমতার দম্ভে তারাই ভুলে যায় যে আন্দোলনের চাপেই আইন বদলায় - যুগোপযোগী হয় । গণতন্ত্রের শর্তগুলো যেখানে সচেতন ভাবে পদদলিত হয় সেখানে সরকারী জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াও নিতে পারে কুমিরের চরিত্র - যা চোখের জল ফেলে শিকারকে গ্রাস করার আগে । পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাম্প্রতিক জমি অধিগ্রহণে প্রক্রিয়া কি এমনই ছিল ?

সিঙ্গুরের পর নন্দীগ্রামে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জমি অধিগ্রহণ করতে চেয়েছে । দশ হাজার একর জমি দরকার । এত বিশাল পরিমাণ জমি নেবার জন্য সরকার কোন সত্যিকারের আলাপ-আলোচনাও শুরু করার প্রয়োজন বোধ করেনি । মানুষ কানাঘুষো এবং সরকারী সূত্র থেকে বেড়িয়ে আসা খন্ড সংবাদ শুনে সন্ত্রস্ত হয়েছে । নিজেরা ধর্মীয়-রাজনৈতিক আনুগত্য নির্বিশেষে দলবদ্ধ হয়েছে । এই সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের মোকাবিলায় সরকার নির্ভর করেছে পুলিশ ছাড়াও সি পি এমের পেশী শক্তির উপর । মুখ্যমন্ত্রীর পরিমাপে যা কিনা ২৩৫ / ৩০ । হিসাবে কিছু ভুল হয়েছে । নন্দীগ্রামে বহু মানুষ পার্টি ছেড়ে ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটিতে যোগ দিয়েছে । তবুও কিছু মানুষ পার্টির প্রতি আনুগত্য বজায় রেখেছে - হাজার হোক পার্টিই তো খাওয়াচ্ছে । অনুগতদের সঙ্গে সংঘর্ষ বেধেছে ।

এই রকম অবস্থায় কে কাকে আগে মেরেছে বা গালি দিয়েছে সে বিচার নিরর্থক এবং বিভ্রান্তিকর । পিপলস ট্রাইবুনাল অফ নন্দীগ্রাম ঘটনা প্রবাহের আগাগোড়া বর্ণনা দিয়েছে এবং সমস্ত সংবাদ মাধ্যমে ঘটনাবলীর প্রচার হয়েছে । রাজ্যপাল স্বয়ং ১৪ই মার্চ ও ১০ই নভেম্বরের ঘটনায় গভীর বেদনা, শঙ্কা এবং ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন । কলকাতা হাইকোর্ট ১৪ই মার্চের ঘটনাকে সংবিধান বিরোধী বলে রায় দিয়েছেন । এই সমস্ত কিছু সত্ত্বেও খুনী এবং অত্যাচারীদের কোন শাস্তি হয়নি বরং ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের বিরুদ্ধে সরকার অভিযোগ

দায়ের করেছে । সি. বি. আই পার্টির যে দশজন ঘাতককে ধরে দিয়েছিল তাদের পুলিশ মুক্তি দিয়েছে । এই বিবরণ প্রামাণিক এবং সবারই জানা ।পার্টি অবশ্য সংঘাতের বিরুদ্ধে সতর্কতা জারি করেছে । বিনয়ের এটুকুই প্রকাশ - আমাদের কাজে বাধা দিলে ওদের লাইফ হেল করে দিতে পারি । কাজেই সাবধান ।

"This way for eternal suffering. This way to join the lost people - Abandon all hope, you who enter".

আমাদের প্রশ্ন -

১) নন্দীগ্রাম ঘটনা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোন রূপ প্রকাশ করে ?

২) নন্দীগ্রাম ঘটনা স্থানীয় মানুষের কোন রূপ প্রকাশ করে ?

৩) দায়িত্বশীল বিরোধী দল কি শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারতো না ?

সরকারের স্বরূপ :

২০০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের বিজ্ঞপ্তি প্রথম সরকারী পদক্ষেপ। এর ফলে শুরু হয় সংঘর্ষ । মুখ্যমন্ত্রী বিজ্ঞপ্তিকে অগ্রাহ্য ঘোষণা করার পরও লক্ষণ শেঠ বিজ্ঞপ্তি সমর্থন করেন । সি পি এমের বিভিন্ন নেতা বিভিন্ন সুরে কথা বলতে থাকেন ।তার ফলে সাধারণ মানুষ পার্টি ও প্রশাসনের উপর আস্থা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে । ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে সরকার জমি অধিগ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মানুষের জীবন ও জীবিকার প্রতি সংবেদনশীল থেকে বা তাদের আইনি এবং নৈতিক অধিকারকে মর্যাদা দিয়ে কোন সুচিন্তিত পন্থাই গ্রহণ করেনি । বরং নিজেদের রাজনৈতিক একাধিপত্যের ও পার্টি নিয়ন্ত্রিত ঘাতক বাহিনীর শক্তির মদে মত্ত সরকার সমস্ত বিরোধিতাকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেবার ক্ষমতায় প্রত্যয়ী হয়ে অসহিষ্ণুতার সঙ্গে জমি অধিগ্রহণে উদ্যোগী হয়েছে । এই উদ্যোগ সভ্যতা বিরোধী, অমানবিক এবং স্ট্যালিনিষ্ট মানসিকতার অনুসারী । ক্ষমতার মদে মত্ত হলে মানুষ যেমন ভুল করে সি পি এম তেমনই ভুলে গেছে স্বাধীনতার ঠিক আগেই অবিভক্ত কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে এই এলাকার মানুষের তেভাগা আন্দোলনে বীরত্বের ঐতিহ্য । জমি অধিগ্রহণের বাসনা পরিত্যাগ করার পরও এলাকার নিয়ন্ত্রণ হাতে রাখার জন্য মানুষ খুন-জখম করা ছাড়াও নারীর উপর অত্যাচারের যে কাহিনী সৃষ্টি হয়েছে

তা এই পার্টির অস্তিত্বকে চির কলঙ্কিত করেছে । এই সরকারের স্বরূপ ক্রমশই মানুষের মনে গেঁথে যাবে এক দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা রূপে ।

নন্দীগ্রামের মানুষের স্বরূপ :

নন্দীগ্রাম পূর্ব মেদিনীপুরের অংশ । পূর্ব মেদিনীপুর তেভাগা আন্দোলন খ্যাত । স্বাধীনতার অব্যবহিত আগেই এই এলাকায় মুক্তাঞ্চল গড়ে উঠেছিল । বিশেষ করে এলাকার মহিলাদের বীরত্ব ইতিহাসে স্থান পেয়েছে । তেভাগা আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল অবিভক্ত কমিউনিষ্ট পার্টি । সাম্প্রতিক ভূমি-উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলনের আগেও এলাকার মূল রাজনৈতিক শক্তি ছিল কমিউনিষ্টরাই - সি. পি. এম ও সি. পি আই । কিন্তু জমি অধিগ্রহণের প্রশ্নে বহু মানূষ আনুগত্য ত্যাগ করে প্রতিরোধ কমিটিতে যোগ দেয় ।

প্রতিরোধ কমিটিতে এমন অনেকেই ছিল যার অতীতে সি পি এমের হয়ে অনেক অপারেশনে যোগ দিয়েছে । তারা ছিল পার্টির দ্বারা সশস্ত্র । গুলি-বারুদের উৎসও তারা জানত। সবথেকে বড় কথা এরা সরে আসায় সি পি এমের শক্তি কমে যায় এবং এরা সি. পি. এমের এলাকা দখল পদ্ধতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিল । হতে পারে অন্যান্য দলেরও এমন কিছু সশস্ত্র কর্মী ছিল । এদের সঙ্গে ছিল সাধারণ লড়াকু মানুষ যারা লড়াইয়ের ঐতিহ্যে বলীয়ান । তাই প্রথমেই এক ঝটকায় সি পি এমের অনুগতজনরা লড়াই থেকে ছিটকে যায় । শুধু পুলিশের সুরক্ষায় পোষা ঘাতক বাহিনীর হিংস্র আক্রমনে প্রতিরোধকারীদের এলাকা থেকে উৎখাত করা সম্ভব হয় । তবুও তাদের পদানত করা যায়নি । এমন অচিন্তনীয় যাদের মানসিক দৃঢ়তা কোন অমোঘ শক্তি তাদের বেঁধে রেখেছে অনগ্রসরতার বদ্ধ জলায় ??

শান্তিপূর্ণ আন্দোলন :

কোন কোন চিন্তাশীল পর্যবেক্ষক পার্টি ও সরকারের খলতার নিন্দা করতে গিয়ে একই সঙ্গে আন্দোলনের জঙ্গিপনার নিন্দা করেছেন । যদিও নীতিগতভাবে জঙ্গিপনা পরিত্যাগ করাই শ্রেয় তবুও প্রশ্ন থেকে যায় নন্দীগ্রামের লড়াইটাকি শান্তিপূর্ণ হতে পারত ? । প্রথমতঃ লড়াইয়ের

পদ্ধতি ঐতিহ্যকে বাদ দিয়ে সৃষ্টি হয় না । নন্দীগ্রামের ঐতিহ্যে অবিভক্ত কমিউনিষ্ট পার্টির অবদান আছে । দ্বিতীয়তঃ কার বিরুদ্ধে লড়াই - তাও প্রভাবিত করে লড়াইয়ের পদ্ধতি । সি পি এমের পদ্ধতি এলাকার মানুষ ভালই জানত । শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের নেতাদের বিরুদ্ধে পার্টি সব রকম ব্যবস্থাই নিতে পারে । গ্রামীণ জীবনের নিত্যকার সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা, মিথ্যা পুলিশ কেস দেওয়া, এমন কি চোরা ঘাতকের শিকারে পরিণত করা, সবই সম্ভব । সিঙ্গুরের তাপসী মালিকের উদাহরণ এদের সামনে ছিল । সিঙ্গুরের দুর্বল কিন্তু দৃঢ়চেতা লড়াই এরা দেখেছে ।

মহাত্মা গান্ধীর মত কোন প্রতিভা নন্দীগ্রামের আন্দোলনকে শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহের পথে সাফল্যে পৌছে দিতে পারত কিনা তা গবেষকের আলোচনার বিষয় হতে পারে কিন্তু নন্দীগ্রামের আন্দোলন যে পথে এগিয়েছে তা এই এলাকার ঐতিহ্য ও পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। এখানে মাওবাদীদের উসকানির তত্ত্বও হালে পানি পায়নি । এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে । সবরমতী আশ্রমের প্রদর্শনী কক্ষের দেয়ালে স্যার বার্ট্রান্ড রাসেলের একটা উক্তি লেখা আছে । গান্ধীজীর রেল রোকো আন্দোলনের সাফল্য সম্বন্ধে রাসেল বলেছেন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আন্দোলন সাফল্য পেয়েছে । ট্রেনটি সত্যাগ্রহীদের পিষে দিয়ে এগোয়নি । কিন্তু এই আন্দোলন সম্ভবতঃ ষ্ট্যালিনের বিরুদ্ধে সাফল্য পেত না । জানি না নন্দীগ্রামের মানুষ একথা মনে রেখেছিলেন কিনা ।

উপসংহার :

সমাজতন্ত্রের আদর্শ নিয়ে ক্ষমতায় এসেছি সি. পি. এম. । ধীরে ধীরে সমাজতন্ত্রের স্বপ্নটাই হারিয়ে যায় যদিও ইতিমধ্যে ক্ষমতার ভিত্তিটা হয় দৃঢ় । পার্টি ক্ষমতাটাই আঁকড়ে ধরে এবং সমস্ত কৌশলে আরও তাকে আরও দৃঢ় করায় যত্নবান হয় । অথচ আদর্শের পুনর্নির্মানের কাজটা থেকে যায় অবহেলিত । এখানেই আসে অন্তঃসারশূণ্যতা - যার স্বাভাবিক সঙ্গী শঠতা, আত্মম্ভরিতা ও অসহনশীলতা । শিল্পায়ন - যা রাজ্যে স্বাভাবিক গতিতেই হবার কথা যদি উপযুক্ত প্রশাসনিক ও বাস্তব পরিকাঠামো গড়ে তোলা যায় - হয়ে ওঠে অন্তঃসারশূণ্যতার পূরক । তাই

বামফ্রন্ট সরকারের শিল্পায়নের সদম্ভ প্রচার তার শিক্ষা, স্বাস্থ্য বা দারিদ্র্যদূরীকরণের প্রাথমিক কর্তব্যে ব্যর্থতাকে আড়াল করার লক্ষ্য পায় । এই পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের গত তিন দশকের ইতিহাস একটা আদর্শের অবক্ষয় ও অপমৃত্যুর কাহিনি । এই অবক্ষয়ের অপরদিক কমিউনিষ্ট স্বৈরতন্ত্রের তমসাঘন ভ্রুকুটি ।এই সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিত ঘনসংবদ্ধভাবে ধরা পড়েছে নন্দীগ্রামে ।

বর্তমান লেখাটা শুরু করেছিলাম একটা চরম হতাশাজনক পরিস্থিতিতে - যখন সি. পি. এমের ক্রূরতা নন্দীগ্রামবাসীকে ঠেলে দিয়েছিল অন্তহীন খাদের কিনারে, পঞ্চায়েত নির্বাচনের ঠিক আগে । অবাক বিষ্ময়ে তারপর আমরা দেখেছি নন্দীগ্রামবাসীর দুর্দমনীয় সঙ্কল্প । নির্বাচনের ফলে দানবিক শক্তিধর সি. পি. এম ধরাশায়ী । মানুষ নতুন আশায় আবার বুক বেঁধেছে । কমিউনিষ্ট পার্টির হাত থেকে মুক্তির আশায় । হায় ! পার্টি কেন আগেই মরে বাঁচল না ! বেঁচে মরল ! নন্দীগ্রামে লেখা হল নতুন ইতিহাস ।